স্তন ক্যান্সার হলেই অপারেশন নয়

একটি স্তনে ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পর তা অপরটিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভয়ে অনেকেই তাদের সুস্থ স্তনটিকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এমনকি ক্যান্সার একেবারে প্রাথমিক স্তরে শনাক্ত হলেও জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তারা। কথায় বলে, ক্যান্সার নো আন্সার! আর এখন দেখা যাচ্ছে, সেই উত্তরের সঠিক খোঁজ না পেয়ে নিজেদের ইচ্ছাতেই সুস্থ স্তনটিকেও অস্ত্রোপচার করে বাদ দিচ্ছেন অনেক নারীই। সাম্প্রতিক একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, দুটি স্তন বাদ দেয়ার ঘটনা বেড়ে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। অথচ মেডিকেল সায়েন্সে একটি স্তনে ক্যান্সার হলে শুধু সে স্তনটি অপারেশন করাই যথেষ্ট। ক্যান্সার যদি অপর স্তনটিতে ছড়িয়ে না যায়, তবে অন্যটিকে বাদ দেয়ার কোনো প্রয়োজনই সাধারণত পড়ে না। কিন্তু ক্যান্সারে আক্রান্ত স্তনটিকে সারিয়ে তোলা আদৌ যাবে কি-না অথবা অপর স্তনটিতে যে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়বে না-ডাক্তাররা এ গ্যারান্টি দিতে না পারায় আজকাল আগেভাগে দুটি স্তনেই অস্ত্রোপচার করাচ্ছেন নারীরা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে পরিচালিত ওই সমীক্ষায় অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রোফিল্যাকটিক ম্যাসটেকটমি অর্থাৎ সুস্থ স্তনকে অপারেশন করে বাদ দেয়ার যে পদ্ধতি তাতে স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। একটু ভেবে দেখলে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদিকে সুস্থ স্তনটিতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি না থাকলে এ ধরনের অপারেশনের কোনো প্রয়োজন যে নেই তা বলাই বাহুল্য। অথচ প্রোফিল্যাকটিক ম্যাসটেকটমি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাবে অনেক নারীই আজকাল দুটি স্তনই কেটে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বাফেলো রাজ্যের রসওয়েল পার্ক ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. স্টেফেন এজ ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে নিউইয়র্কের সব তথ্য ঘেঁটে দেখেন এ সময় প্রায় ৬ হাজার ২৭৫ জন মেয়ে তাদের ক্যান্সার নেই এমন স্তনটির অপারেশন করিয়েছেন। অবাক করার বিষয়, তাদের মধ্যে শুধু ৮১ শতাংশের অপর স্তনটিতে ক্যান্সার শনাক্ত করা হয়েছিল। বাকি ১৯ শতাংশ নারীর কিন্তু কোনো স্তনেই কোনো ধরনের ক্যান্সার ছিল না। এমনকি তাদের পরিবারের মধ্যেও ক্যান্সারের কোনো রকম ইতিহাস ধরা পড়েনি। ড. এজ জানান, পরিবারে স্তন ক্যান্সার বা ক্যান্সারের সমস্যা না থাকলে শুধু ঝুঁকি এড়াতে প্রোফিল্যাকটিক ম্যাসটেকটমির মতো অপারেশনের মধ্য যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া কোনো নারীর যদি একটি স্তনে ক্যান্সার শনাক্ত হয়, তবে এই অপারেশনে যাওয়ার আগে তাকে একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এর কুফল এবং অপারেশন না করালে সম্ভাব্য ঝুঁকির ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শ নেয়া উচিত। (ইন্টারনেট অবলম্বনে)

কী করে বুঝবেন স্তন ক্যান্সার

স্তন ক্যান্সারের নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনও জানা যায়নি। তাই একাধিক কারণকে স্তন ক্যান্সারের জন্য দায়ী করা হয় :

জেনিটিক ফ্যাক্টর : যেমন-মা-খালার থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ষ অবিবাহিত বা সন্তানহীনা মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ বেশি।

ষ একইভাবে যারা সন্তানকে কখনও স্তন্য পান করাননি, তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হয়।

ষ ৩০ বছর পরে যারা প্রথম মা হয়েছেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা একজন কম বয়সী মা হওয়া মহিলার থেকে অনেক বেশি।

ষ বয়স যত বাড়ে, স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও তত বৃদ্ধি পায়।

ষ অল্প সময়ে বাচ্চা নিলে, দেরিতে মাসিক শুরু হলে, তাড়াতাড়ি মাসিক বন্ধ হলে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ বেড়ে যায়।

ষ একাধারে অনেক দিন জন্মনিরোধক বড়ি খেলেও স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

উপরোক্ত কারণগুলো ব্রেস্ট ক্যান্সারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এগুলোই একমাত্র কারণ নয়।

কী করে স্তন ক্যান্সার বুঝবেন

ষ সাধারণত ৩০ বছরের আগে এই রোগ কম হয়।

ষ বেশিরভাগ রোগী বুকে চাকা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

ষ বুকে চাকা, সেই সঙ্গে কিছু কিছু রোগী ব্যথার কথাও বলে থাকে।

ষ কখনও কখনও বুকে চাকা এবং বগলেও চাকা নিয়ে রোগী আসতে পারে।

ষ নিপল ডিসচার্জ এবং নিপল ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়াও এ রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

ষ কিছু কিছু রোগী বুকে ফুলকপির মতো ঘা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে।

ষ অনেক সময় যে বুকে ব্যথা, সেদিকের হাত ফোলা নিয়েও আসতে পারে।

ষ এগুলো ছাড়া ব্রেস্ট ক্যান্সার দূরবর্তী কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে এমন উপসর্গ নিয়ে আসে; যেমন- হাড়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও জণ্ডিস ইত্যাদি।

আতাউর রহমান কাবুল

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মধুবনের মিষ্টি এখন পাবেন বাংলা টাউনের ব্রিকলেইনে।

লণ্ডনে মিষ্টির জগতে আমরাই সেরা।

আমাদের স্পেশাল আইটেম পরখ করে দেখুন

দুধ, ছানা পুষ্টি মধুবনের মিষ্টি

যে কোন অনুষ্ঠানে আমাদের বিশেষ অতিথিয়েতার সুযোগ নিন

MADHUBON Sweet centre

মধুবন সুইটস সেন্টার ইউকে লিঃ

42 Brick Lane london E1 6RS Tel: 0207 655 4554

245 Bethnal Green Rd london E2 6AB Tel: 0207 613 5757

খিঁচুনির নাম ইপিলেপ্সি

সুদীপ্ত কুমার মুখার্জি।

জুনিয়র কনসালট্যান্ট (নিউরোসার্জারি)

শহীদ শেখ আবু নাসের স্পেশালাইজড হাসপাতাল, খুলনা।

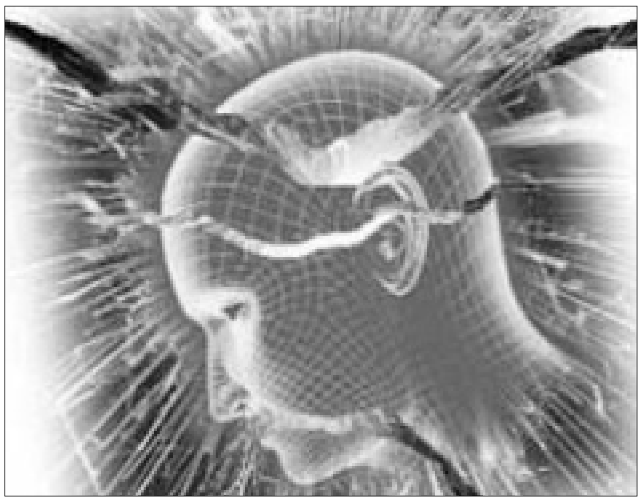

নবম শ্রেণীতে পড়া ক্লাসের ফার্স্ট মেয়েটি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। সে কী খিঁচুনি, চোখ উল্টে মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, কী হলো, কী হলো বলে বান্ধবীদের কান্না, শিক্ষকের উদ্বেগ, আত্মীয়স্বজন সবাই ছুটে এলেন, ওঝা এলেন মরিচের ধোঁয়া, জুতা পড়া আর তাবিজ নিয়ে। ম্যাডাম বললেন, এই জ্ঞান আসছে, তোমরা ভিড় কমাও, চিকিৎসক ডাকো। চাচা বললেন, না থাক, ওঝাই দেখুক। মা বললেন, ও এমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় কেন, কাউকে চিনছে না-এ আমার কী হলো। মেয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, আমি কোথায়? মা, কাঁদছ কেন? ওঝা বললেন, ভয় নেই, অশান্ত পেতনিটা চলে গেছে, এই মাদুলিটা পরুক, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, সে যেন ভর সন্ধ্যাবেলায় গাবতলা দিয়ে চলাফেরা না করে। সে কথাই ফলল আবার তিন দিন পরে। রাতে খাওয়ার আগেই মেয়ের উপরিবাই আবারও ফিরে আসে। এবার গাছে বেঁধে পেতনিকে পিটিয়ে গ্রামছাড়া করল। মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ, মায়ের প্রাণ মানে না। মেয়েকে নিয়ে এলেন একজন তরুণ চিকিৎসকের কাছে, চিকিৎসক হুংকার দিলেন ওঝাকে বেঁধে আনার।

চিকিৎসা নিয়ে আজ সেই ছোট মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী। হ্যাঁ, এটাই ইপিলেপ্সি রোগ।

ইপিলেপ্সি বা মৃগী রোগ গ্রিক শব্দ ইপিলেপ্সিয়া থেকে এসেছে। ইপিলেপ্সি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং এ রোগে বারবার খিঁচুনি দেখা দেয়। মানুষের মস্তিষ্কে অল্প সময়ের জন্য অধিক মাত্রায় বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়াই এর মূল কারণ। কেউ কেউ একে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক গোলযোগ বলে থাকে। বাংলায় একে তড়কা বা সন্ন্যাস রোগও বলা হয়। খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত রোগীর কিছু নিয়ম মানতে হবে-

? আগুনের কাছে যাবে না।

? ছাদে উঠবে না।

? বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবে না।

? একা রাস্তা পার হবে না।

? পুকুর বা নদীতে গোসল করবে না।

? বিপজ্জনক কোনো যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবে না।

? এ রোগে পেশাগত কাজে কোনো বাধা না থাকলেও গাড়ি চালানো উচিত নয়।

? চিকিৎসকের ক্ষেত্রে যাঁরা সার্জন বা শল্যচিকিৎসক, তাঁদের পেশা পরিবর্তন করা উচিত।

? অতিমাত্রায় টিভি দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা ঠিক নয় (টেলিভিশন বা কম্পিউটারের মনিটরের কম্পমান আলো ইপিলেপ্সির সৃষ্টি করতে পারে)।

? অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে খিঁচুনি হতে পারে।

? উচ্চশব্দ ও গরম পানিতে গোসলের কারণে খিঁচুনি হতে পারে।

এসব রোগীকে ওপরের কারণ এড়িয়ে চলা উচিত।

এ সম্পর্কে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজন সবারই ধারণা থাকা উচিত। কোনো কোনো মহিলা মাসিকের সময় এ রোগে ভোগেন। ওষুধ খাওয়ার সময় সন্তান ধারণ করতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে, ভেলপোরেট-জাতীয় ওষুধ খাওয়ার সময় সন্তান ধারণ উচিত নয়। তবে কার্বামাজেপিন ওষুধ গর্ভস্থ বাচ্চার জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আধুনিক ওষুধে মাতৃদুগ্ধ পান অথবা পড়াশোনায় কোনো অসুবিধা হয় না।

? রোগীকে সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো, মোটরসাইকেল বা বাইসাইকেল চালানো থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখতে হবে।

? এ রোগে সংসার করা, লেখাপড়া করা, বিয়ে করায় কোনো নিষেধ নেই।

? এসব ওষুধ চলাকালীন ইনডাইজেশনের ওষুধ, অ্যান্টাসিড, এসপিরিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম একসঙ্গে খাওয়া নিষেধ।

? রোজ একই সময়ে ওষুধ খেতে হবে।

এ ধরনের রোগীর গলায় একটা লকেটের ভেতর কাগজে তার পরিচয় এবং ফোন নম্বর লিখে রেখে দেওয়া উচিত।

আসুন, ইপিলেপ্সির কারণ সম্পর্কে একটু ধারণা নিই ব্রেন টিউমার, মাথায় আঘাত লাগা, রক্তে লবণের তারতম্য, স্ট্রোক, ইনফেকশন (মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস), শরীরে লবণের তারতম্যের পাশাপাশি কোনো নির্দিষ্ট কারণ না-ও থাকতে পারে।

লক্ষণ: বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শরীরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি, বাচ্চার চোখ উল্টে যাওয়া, শরীর দোলানো, জোরে কাঁদা ইত্যাদি ঘটার মাধ্যমে আক্রমণের সূত্রপাত হয়। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময় বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এতে শরীরে আঘাত লাগা, তারপর জিহ্বায় কামড় লাগতে পারে।

অনেকেই খিঁচুনি হওয়ার আগে বুঝতে পারেন। রোগীর শরীরে অস্থিরতা থাকে, পেট ফাঁপা থাকে, সময়কে 'অরা' বলা হয়। এরপর রোগী মাটিতে পড়ে গিয়ে খিঁচুনি শুরু হয়। তারপর শরীর শিথিল হয়। তারপর অনেকক্ষণ রোগী কিছুই চিন্তা করতে পারে না বা মনে করতে পারে না। শরীরে খুব ব্যথা ও দুর্বলতা দেখা যায়।

পরীক্ষা: ইপিলেপ্সির কারণ নির্ণয়ের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইইজি এবং এমআরআই করা প্রয়োজন। এ দুই পরীক্ষায় রোগীর কোনো ক্ষতি হয় না। ইইজির মাধ্যমে ব্রেনের বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো পরিমাপ করা হয়। এতে খিঁচুনির ধরন ও উৎসস্থল নির্ণয় করা যায়। এমআরআইয়ের মাধ্যমে ব্রেনের গঠন বোঝা যায়।

চিকিৎসা: রোগীকে শোয়াতে হবে। (সম্ভব হলে এক পাশে কাত করে দিতে হবে)। কোমর তথা শরীরের সব শক্ত বাঁধন খুলে দিতে হবে। হাত ও পায়ের কাছের সবকিছু, যাতে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে, তা সরিয়ে নিতে হবে। যত শিগগির সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

এ রোগের চিকিৎসার জন্য কমপক্ষে তিন বছর একটানা ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে তিন-চার মাস ওষুধ ব্যবহারের পর রোগী ও তার আত্মীয়রা মনে করে, রোগ সেরে গেছে এবং ওষুধ বন্ধ করে দেয়। এ কাজ কখনোই করা উচিত নয়। এভাবে বন্ধ করার ফলে খিঁচুনি আবারও ফিরে আসে। নতুন করে তৈরি হওয়া এ খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে যায়।

এ রোগ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ওষুধ পাওয়া গেলেও সব ওষুধেরই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। ফলে চিকিৎসা চলাকালে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এসব ওষুধ লিভার, কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, হতে পারে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম নামক প্রাণঘাতী জটিলতা, রক্তের অণুচক্রিকা কমে যেতে পারে এসব কথা জেনে ওষুধ খাওয়াতে হবে, একবারের জন্যও ওষুধ বন্ধ করা যাবে না, এমনকি চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া ওষুধের কোম্পানিও পরিবর্তন করা যাবে না। বলা হয়, ভাত খেতে ভুলে গেলেও ওষুধ খেতে ভুলবেন না। তবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে চিকিৎসকই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। উপায় নেই। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যদি হয় চোর, খিঁচুনি হলো ডাকাত।

তাই তো চোর রেখে ডাকাতের সঙ্গে সহবাস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খিঁচুনি ওষুধে নিয়ন্ত্রণ হয় না। তখন মস্তিষ্কে অপারেশনের প্রয়োজন হয়। আধুনিক সময়ে ডিবিএস নামক যন্ত্রের সাহায্যে অপারেশনে বেশ সফলতা পাওয়া গেছে। খিঁচুনির সব ওষুধকে অ্যান্টিইপিলেপ্টিক বলা হয়। এ ধরনের সব ওষুধই লিভারের সমস্যা, রক্তে সমস্যা, শরীর ও চামড়ায় দাগ বা বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর প্রধান কারণ প্রসবকালীন নবজাতকের মস্তিষ্কে আঘাত লাগা। এ রোগ বংশধরদের ভেতরে সরাসরি প্রবাহিত না হলেও একই পরিবারে বেশি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় বাচ্চাদের অতিরিক্ত মাত্রায় জ্বরের কারণে খিঁচুনি হয়ে থাকে। একে ফেব্রাইল কনভালশন বলা হয়।

শেষ কথা: ইপিলেপ্সি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ রোগ সম্বন্ধে রয়েছে অনেক কুসংস্কার। অনেকের ধারণা, জিনের আছর লাগা, মন্দ বাতাস, অভিশাপ প্রভৃতি এ রোগের কারণ, যা সঠিক নয়। ডাক্তার সাহেব, কত দিন ওষুধ চালাব-এখন তো আর পারি না, রোগীর খিঁচুনিও বন্ধ, দামেও পারি না। প্রয়োজনে কম দামের ওষুধ খাওয়ান, কিন্তু দয়া করে বন্ধ করবেন না, না, না। বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী ওষুধ কমাতে হয় অথবা বন্ধ করতে হয়। খিঁচুনি আবারও ফিরে এলে আবার ওষুধ শুরু করতে হবে।

আসুন, সবাই মিলে অনুধাবন করি এ রোগ মস্তিষ্কের এবং এ রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সম্ভব।